দাম ২ টাকা

পৃথিবীর ডায়েরি

বছর ১৭, সংখ্যা: ৭ | প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকা | অক্টোবর ২০১৬

জানা অজানা

একই রকম আছে, ৮০ লক্ষ বছর ধরে

উত্তর আমেরিকায় যে কুমির দেখা যায়, ৮০ লক্ষ বছর ধরে তাদের আকার আকৃতি, মুখের গঠন প্রায় একই রকম থেকে গেছে। নানা ফসিল পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন বিজ্ঞানীরা। বলা হচ্ছে হাঙ্গর ছাড়া আর কোনও মেরুদন্ডী প্রাণী এত দীর্ঘ সময় ধরে নিজেদের আকৃতি এক রকম রাখতে পারেনি। সময়ের সঙ্গে বদলে গেছে তারা। বদলায়নি কুমির।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লরিডা ইউনিভারসিটির গবেষক ইভান হোয়াটিং বলেছেন, ৮০ লক্ষ বছর পেছনে চলে গেলেও আমরা আজকের মতোই দেখতে কুমিরদের ঘুরে বেড়াতে দেখব। একটি অতি প্রাচীন কুমিরের মাথার ফসিল দেখে তাঁদেরও প্রথমে ধারণা হয়েছিল সেটি বোধহয় কোনও এক বিলুপ্ত প্রাণীর অবশেষ। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা যায় সেটি অবিকল সেই সব কুমিরের মতো যেগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ দিকে পাওয়া যায়।বলা হচ্ছে ওই কুমিররা ৮০ লক্ষ বছর ধরে প্রকৃতিতে নানা পরিবর্তন আর ওলটপালট সহ্য করে নিজেদের শুধু টিকিয়েই রাখে নি, অপরিবর্তিতও রেখেছে। কিন্তু গত শতাব্দীতে তারা প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছিল। কারণ, তাদের চামড়ার জন্য তাদের শিকার করা হত নির্বিচারে।

Gevi 2

মানুষের গায়ে লোম নেই কেন

খাবার জোগাড় করতেই কি লোম খুইয়ে ছিল মানুষের পূর্বপুরুষ?

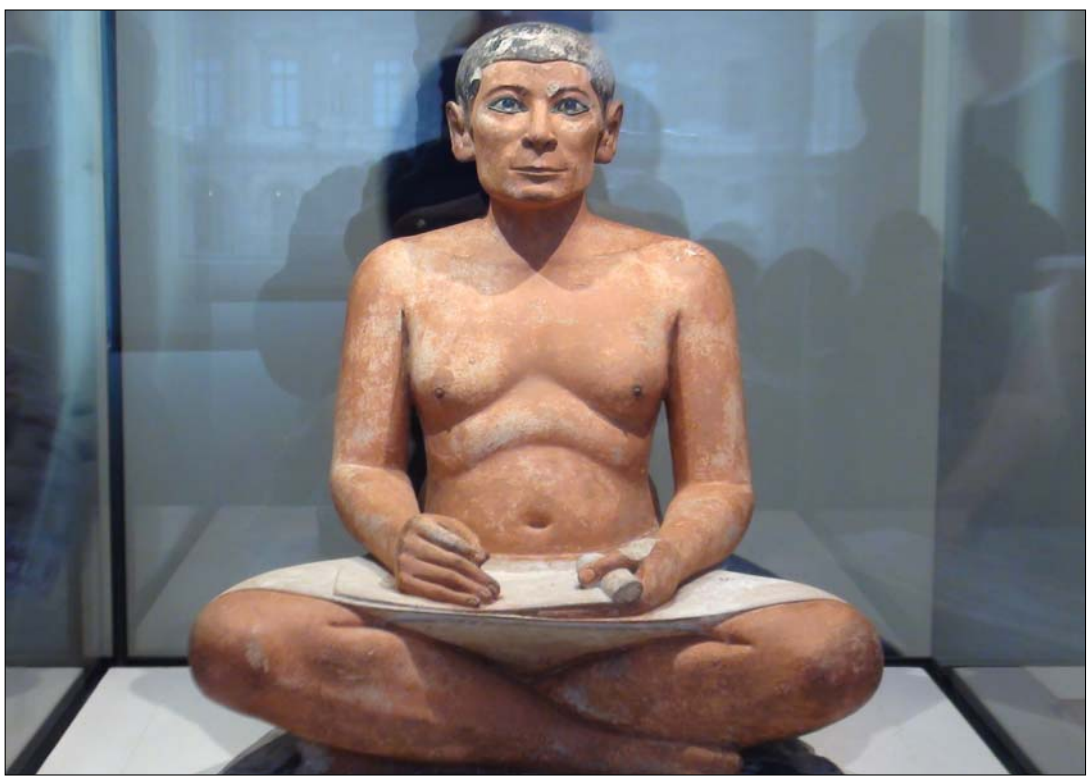

বিজ্ঞানীরা বলেন মানুষ এসেছে বানর থেকে। অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে চালাতে এক সময় মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। বানর থেকে মানুষের আবির্ভাব বলে তাদের সঙ্গে বেশ কিছু মিল রয়ে গেছে মানুষের। বিশেষ করে শিম্পাঞ্জিদের সঙ্গে মানুষের মিল দেখার মত। কিন্তু সব বানরের সঙ্গেই মানুষের একটা বিশেষ অমিল আছে। বলা যায় স্থলের প্রায় সব প্রাণীর সঙ্গেই মানুষের সেই অমিলটা বেশ প্রকট। সেটা হল স্থলচর সব প্রাণীর শরীরেই লোম আছে; মানুষের নেই।

তবে এক সময় মানুষের পূর্বপুরুষদের শরীর লোমে ঢাকা থাকত। তারা দু পায়ে হেঁটে চলে বেড়ালেও, তাদের শরীরের গঠন ছিল ভারী, আর আজকের শিম্পাঞ্জিদের মতোই তাদের সর্বাঙ্গে ছিল লম্বা লম্বা চুলের মত লোম। কিন্তু সেই সুদূর অতীতের দ্বিপদ প্রাণীরা যখন 'হোমো সেপিয়েন্স' বা মানুষ হয়ে উঠল, তত দিনে তাদের শরীর থেকে সব লোম খসে গেছে, ত্বক হয়েছে আবরণহীন। কেন এমনটা হল? বিবিসি আর্থ-এর প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে নানা দেশের বিজ্ঞানীরা এই রহস্য সমাধানের চেষ্টা করছেন আর নানা তত্ত্ব খাড়া করছেন মানুষের লোমহীন হয়ে পড়ার কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য।

তাঁদের অনেকেই বলছেন যে খাবার সংগ্রহ করতে গিয়েই মানুষের পূর্বপুরুষরা তাদের লোম খোয়াতে থাকে। ব্যাপারটা মোটেই সম্প্রতি ঘটেনি। প্রবণতাটা শুরু হয়েছিল হয়তো ৩০ বা ২০ লক্ষ বছর আগে, যখন দুপায়ে-চলা মানুষের পূর্বপুরুষরা কোনও এক বিশেষ কারণে ছায়া-ঘেরা ঘন নিবীড় অরণ্য ছেড়ে অনেক বেশি খোলামেলা পরিবেশে বসবাস করতে শুরু করে। সেখানে তারা দিনের অনেকটা সময় কাটায় খোলা প্রান্তরে পশু শিকার করে ি খাদ্যের চাহিদা মেটাতে। উন্মুক্ত অঞ্চল মানেই সেখানে সূর্যের প্রখর আলো, গরম বাতাস। তারই মধ্যে তাদের ছুটে বেড়াতে হয় শিকারের পেছনে। শুধু ফলমূলে আর শরীরের চাহিদা মেটে না। পেশী গঠনে, শক্তি যোগাতে চাই মাংস। এবং ছুটে-চলা বন্য প্রাণীর পেছনে ধাওয়া করতেই হয় তাদের। ফলে গরম হয়ে ওঠে শরীর। তাই শরীর ঠান্ডা রাখতে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি মানুষের সেই পূর্বপুরুষদের শরীরের লোম কমিয়ে দিতে থাকল। সে কাজ সম্পন্ন করতে প্রকৃতির সময় লাগল। প্রায় ১৮ লক্ষ বছর আগে মানুষের নিকটতম পূর্বপুরুষ, 'হোমো ইরেক্টাস', যখন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল, তখন তার শরীরে লোম অনেকটাই হাল্কা হয়ে গেছে। সে দু'পায়ে অনায়াসে হাঁটে। ছুটে বেড়ায়। ঝাঁঝাঁ রোদে বন্য প্রাণীদের ধাওয়া করে অবসন্ন করে তাদের শিকার করে। শক্ত দাঁত আর চোয়ালের সাহায্যে কাঁচা মাংস ছিঁড়ে খায়। তারপর আরও অনেক লক্ষ বছর পরে যখন 'হোমো ইরেক্টাস' থেকে পৃথিবীতে আসে 'হোমো সেপিয়েন্স' বা মানুষ, তত দিনে সেই নতুন, সবচেয়ে হিংস্র, সবচেয়ে নির্মম, সবচেয়ে বিধ্বংসী প্রাণীটির শরীর থেকে প্রায় সব লোম উধাও হয়ে গেছে।

নতুন প্রাণী

এক নতুন প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে উত্তর-পূর্ব ভারতের সিকিম রাজ্যে। ছোট্ট প্রাণী। নাম পিকা। দেখতে ছোট খরগোস বা একটু বড় ধরনের ল্যাজবিহীন ইঁদুরের মত। বৈজ্ঞানিক নাম 'অকোটোনা সিকিমারিয়া'। এর সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানী নিশমা দাহাল।

উনি বলেছেন পিকা নামক প্রাণীটি উত্তর আমেরিকায়ও দেখা যায়। তবে সিকিমে যেটিকে দেখা গেছে, সেটি

একেরারেই স্বতন্ত্র প্রজাতির। থাকে হিমালয়ের খুব উঁচু অঞ্চলে। সেখানে শীতের সময় প্রবল ঠান্ডায় তারা মোটেই শীতঘুম ঘুমোয় না। ঠান্ডার দিনগুলি শুরু হওয়ার আগেই তারা খাবার মজুত করে রাখে, আর তাই খেয়ে কাটিয়ে দেয় বরফ-পড়া মাসগুলি।

সূত্র: টাইমস অফ ইন্ডিয়া

মুম্বাইয়ে ফ্লেমিঙ্গো

মেগাসিটি মুম্বাইতে দু কোটি মানুষ থাকেন। তাঁদের অর্ধেকের বেশি থাকেন বস্তিতে। এগুলি আমরা জানি। কিন্তু এটা কি জানি যে মুম্বাইতে অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যও দেখতে পাওয়া যায়। থানে ক্রিকে প্রতিবছর তিরিশ হাজারেরও বেশি ফ্লেমিঙ্গো পাখি আসে উত্তরের গুজরাট থেকে। আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকেও।

থানে ক্রিক বা খাঁড়ির উত্তর দিকটা গতবছর থেকে সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানকার খাঁড়ির বাদাবনে নানা ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকে। ফ্লেমিঙ্গোরা যে শ্যাওলা খায় তা জন্মায় খাঁড়ির কাদায়। কাদার মধ্যে অনেক ঝিনুক, শামুক, কাঁকড়া, লুকিয়ে থাকে। তাও খায় ফ্লেমিঙ্গোরা। বহু মাছ, কাঁকড়া ওই বাদাবনে ডিম পাড়ে।

নতুন ওষুধ

সেই ১৯৮০ সালে বিশ্বের সর্বশেষ অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধটি তৈরি হয়েছিল। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা নতুন অ্যান্টিবায়োটিকের সন্ধান পেয়েছেন যার উৎস মানবদেহের ব্যাকটেরিয়া। মানুষের নাকে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া থাকে। সেইসব ব্যাকটেরিয়ার ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে গিয়েই বিজ্ঞানীরা খোঁজ পেয়েছেন ওই অ্যান্টিবায়োটিকের। যা থেকে তৈরি হয়েছে 'লজুডুনিন' ওষুধ। এখন অবধি প্রায় সব অ্যান্টিবায়োটিককে মাটির ব্যাকটেরিয়া থেকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রথম মানুষের দেহ থেকে মিলেছে।

৮০ লক্ষ বছর

১ পাতা থেকে

তাদের চামড়া দিয়ে তৈরি হত সৌখিন বাক্স, জুতো। কোমরের ও ঘড়ির বেল্ট ছাড়াও আরও কত কী। চড়া দামে বিক্রি হত সে সব সামগ্রী। ক্রমশ চামড়ার চাহিদা বাড়তে থাকায় চলতেই থাকে কুমির শিকার। তবে বিলুপ্তির মুখে পৌঁছে গেলে আইন করে তাদের বাঁচানোর চেষ্টা শুরু হয়। তাদের সংখ্যা এখন বেড়েছে।

পাখির বাসা দিয়ে সুস্বাদু ঝোল

যার বাসা দিয়ে ঝোল বা অম্বল রান্না নাকি খুব সুস্বাদু হয়, সাঁওতালরা বেশ কষ্ট করে যার বাসা ভেঙে সংগ্রহ করে এবং তাই দিয়ে খাবার বানায়, তার নাম তালচোঁচ। তবে বাংলায় তালচোঁচের বাসা দিয়ে খাবার বানানোর তেমন চল বোধহয় নেই। থাকলে আর একটি বাসাও তাদের অক্ষত থাকত না। এবং অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যেত পাখিটি।

সে যাইহোক তালচোঁচের এমন অদ্ভূৎ নাম কেন হল তা বলা মুশকিল। পাখির জগতে তেমন পরিচিতও নয় সে। বাংলার নিজস্ব এই পাখিটিকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সচরাচর দেখাই যায় না। চড়াই'র থেকে সামান্য বড়, কালচে রঙের এই পাখিটির গলায় ও পিঠে সাদা পালক। সাধারণত পাখিদের চারটে আঙুলের মধ্যে তিনটি থাকে সামনের দিকে আর একটি পিছনে। কিন্তু তালচোঁচের চারটে আঙুলই মানুষের পায়ের মতো সামনের দিকে মুখ করা থাকে। তাই কখনওই তারা গাছের ডালে বসতে পারে না। আর মাটিতে তারা ব্যাঙের মতো থপথপ করে লাফিয়ে চলার চেষ্টা করে। তালচোঁচরা একা নয় সব সময়ই দল বেঁধে থাকতে ভালবাসে।

চেনা অচেনা পাখি

তাদের বাসাগুলো একটু বিচিত্র ধরনের হয়। পুরনো দালান বা পুরনো মন্দিরের দেওয়ালের খাঁজে তাদের বাসা দেখা যায়। তালচোঁচদের লালা অত্যন্ত আঠালো এবং তা শুকিয়ে গেলে বেশ শক্ত হয়ে যায়। মুখের সেই লালা আর গায়ের খসা পালক দিয়েই তারা বাসা বানায়। বছরে দু'বার দুটো তিনটে করে ডিম পাড়ে। বাংলায় কত বিচিত্র রকমেরই না পাখি আছে। যাদের অনেকের কথাই আমাদের অজানা।

ভাগ্যিস পাখি বিশারদরা তাদের সম্পর্কে নানা খোঁজ খবর দেন। তা নাহলে তো আমরা তাদের কথা জানতেই পারতাম না।

পৃথিবীর ফুসফুস অ্যামাজন আক্রান্ত

আমাদের ফুসফুসের মতো পৃথিবীর ফুসফুসও আক্রান্ত। আর হ্যাঁ, তা বায়ুদূষণেই। আসলে অ্যামাজনের বর্ষারণ্য পৃথিবীর ফুসফুস হিসেবেই পরিচিত। যে বিপুল পরিমান আক্সিজেন জুগিয়ে যাচ্ছে আমাদের এই গ্রহকে। কিন্তু গত সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখ পেরুর অ্যামাজন বর্ষারণ্যে ভয়ঙ্কর দাবানলে জ্বলে ওঠে। দ্য হিন্দু'তে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যাচ্ছে যে, সেখানকার প্রায় ১৯,০০০ হেক্টর ঘন অরণ্যাঞ্চল ও ২০০ হেক্টর চাষের জমি ধ্বংস হয়ে যায় সেই আগুনে। ফলে সেই অরণ্যের আদিম জনজাতি এবং বন্যপ্রাণ এখন খুবই হুমকির মুখে।

আগুনের প্রবল ধোঁয়ায় ভরে গেছে বনাঞ্চল। যাতে সেখানকার অরণ্যবাসিদের চোখের সমস্যা হচ্ছে। স্বাস্থ্যের অন্যান্য সমস্যাও দেখা দিয়েছে বলে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মীরা জানিয়েছেন। আগুনটা লেগেছে অ্যামাজনের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ভ্রায়েম নামে যা পরিচিত। সেই অত্যন্ত ঘন বর্ষারণ্যে ক্রান্তীয় শস্য কফি ও কোকার কাঁচা উপাদান মেলে। স্থানীয় প্রশাসন আশঙ্কা করছেন যে ওই দাবানলে সেখানকার আদিম মানুষ, যাদের বাইরের জগতের সঙ্গে তেমন কোনও যোগাযোগই নেই, তাদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে। এবং ওই আগুনের আঁচ গিয়ে লাগবে স্থানীয় 'ওতিশি জাতীয় উদ্যান'এও।

খবরটি প্রকাশিত হওয়ার সময় পর্যন্ত আগুন আয়ত্বে আসেনি। শুধু তাই নয়, আশঙ্কার ব্যাপার হল, রিও টাম্বো মিউনিসিপ্যাল'র মুখপাত্র জিমি লরা জানিয়েছেন, ওই আগুন এখন পৌঁছে গেছে 'আশানিনকা রিজার্ভ'এও। এবং তাঁর মতে সেই আগুন নিভে না গিয়ে যদি ওই অভয়ারণ্য পেরিয়ে আরও অগ্রসর হতে থাকে তাহলে অচিরেই তা ছুঁয়ে ফেলবে জাতীয় উদ্যানকে।

ওই অভয়ারণ্য অন্তত দশটি আদিম গোষ্ঠীর প্রায় ৫০০০ মানুষের আবাসস্থল। আমাদের উত্তর-পূর্ব ভারতের মতো অনেক জায়গার অরণ্যচারি মানুষ ঝুম চাষ (জঙ্গল পুড়িয়ে জমি পরিষ্কার করে) করেন। অ্যামাজনের আদিম মানুষরাও চাষ করেন সেই ভাবেই। এমনিতেই সেখানে খরা হয়েছিল। তারওপর সেখানে চাষের জমি বার করার জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা যেই জঙ্গল পোড়াতে শুরু করে অমনি তার থেকেই হঠাৎ জঙ্গলে আগুন ধরে যায় এবং ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ক্রমে সেই দাবানল ভয়ঙ্কর রূপ নেয়।

আগুন শেষ পর্যন্ত নিভলেও ক্ষয় ক্ষতির সঠিক পরিমাপ করা হয়তো সম্ভবই হবে না। এবং ওই বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, বনবাসি মানুষ ও সমস্ত বন্যপ্রাণ যে এই মুহূর্তে বিপুল সঙ্কটের মুখে পড়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

টারসিয়ের

দেহের আকারের তুলনায় বৃহত্তম চোখের অধিকারী এই স্তন্যপায়ীটি প্যাঁচা নয়, কিন্তু প্যাঁচার মতোই তার মাথা ১৮০ ডিগ্রি ঘোরাতে পারে। এক সময় এই টারসিয়েরকে পৃথবীর নানা দেশে দেখা গেলেও বর্তমানে কেবল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু দ্বীপের জঙ্গলে তাদের দেখা মেলে। আকারে মাত্র ৫ ইঞ্চি হলে কি হবে, লম্বা লেজ আর হাড়ের মতো শক্ত আঙুলের সাহায্যে গাছে গাছে লাফাতে পারে তারা। পোকা আর ছোট্ট পাখি খেয়ে বেড়ায় ওই রাতচরা প্রাণীটি। খুবই দ্রুত লাফাতে পারে তারা। বছরে একটাই বাচ্চা দেয় মা টারসিয়ের। প্রায় ১৮ প্রজাতির টারসিয়ের'র আচার ব্যবহার ভিন্ন। কেউ নিসঃঙ্গতাপ্রিয়, তো কেউ দল বেঁধে থাকে। তারা ১২-২০ বছর বাঁচে। এই অদ্ভূৎ প্রাণীটির কোনও প্রজাতি বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

প্রাচীন ওষধি খাদ্যঃ কথায় বলে আদার সবই ভাল

জেনে রাখা ভাল

জীবনে কখনও আদা-চা খাননি এমন চা'পানকারি লোক বোধহয় আমাদের দেশে মিলবে না। সেই আদাকেই প্রাচীনতম ওষধি খাদ্য বলা হয়। এবং হাজার হাজার বছর ধরে যার ব্যবহার হচ্ছে এশিয়াতে। যেহেতু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই তার উৎপত্তি স্থল তাই এটা অনুমান করে নেওয়াই যেতে পারে যে প্রাচীনকালে ভারত ও চিনের চিকিৎসকদের ঝোলা বা বটুয়াতে রোগের উপশমকারক হিসেবে আদার টুকরো নিশ্চয়ই থাকত। আদা সম্পর্কে আরও যা জানা যায় -

● বহু যুগ আগে রোমান ব্যবসায়ীরাই দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়া থেকে ইউরোপে আদা নিয়ে গিয়েছিল। যেখানে এই আদা মহার্ঘ হয়ে ওঠে তার নানা উপশম গুণের জন্য।

● একটু উষ্ণ ও স্যাঁত স্যাঁতে জায়গায় ভাল হয় বলে চিন, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জামাইকা'তে তার চাষ হয়। ভারত ও চিনেই সব থেকে বেশি আদা উৎপাদন হয়।

● আয়ুর্বেদে আদা অসাধারণ ওষুধ হিসেবেই চিহ্নিত। ভারতীয় প্রবাদ আছে 'আদার সবই ভাল'।

● তবে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও নানা চিকিৎসায় আদার কার্যকারিতাকে মান্যতা দিয়েছে।

● ব্যথা, ফুলে ওঠা পেশী, বাতের ব্যথা উপশমে আদা সাহায্য করে।

● সেই মধ্য যুগ থেকেই হজমকারি হিসেবে আদার ব্যবহার চালু।

● রক্তচাপ কমাতে, রক্তে কোলেস্টেরল কমাতে আদা সাহায্য করে। সাহায্য করে অ্যাজমার কষ্ট ও মাইগ্রেনের যন্ত্রণা কমাতেও।

● ক্যানসার প্রতিরোধী গুণও আদাতে বর্তমান।

বিশেষ কাঁচ

এখন জানলার কাঁচই আলো কমাবে বাড়াবে। সূর্যের আলো যখন খুব জোরাল হবে, তখন ওই বিশেষ কাঁচ কালো হয়ে আসবে। ফলে সূর্যের আলো ঘরে কম প্রবেশ করবে। আবার আকাশ মেঘে ঢেকে গিয়ে আলো কমে এলে জানলার কাঁচ নিজেই ঝকঝকে হয়ে উঠবে। ফলে বাইরের আলো অবাধে ঘরে ঢুকবে। তবে এটা ঠিক সেই ধরনের চশমার কাঁচের মতো নয়, যা আলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অনেকে এমন চশমা ব্যবহার করেন যেগুলি বাইরে বেরলে কালচে হয়ে যায়, আর ঘরের ভেতর ফর্সা। জানলার এই কাঁচ চশমার কাঁচের তুলনায় খুব দ্রুত রঙ বদলাতে পারে।

বৃহত্তম বীজ

এক ধরনের পাম গাছের বীজ এটি। নাম 'লোডোইসিয়া মলডিভিকা'। বলা হয় ওই গাছের বীজই হল সবচেয়ে বড়। ভারত মহাসাগরে সেচেলস দ্বীপপুঞ্জর মাত্র দুটি দ্বীপে ওই গাছ হয়। কিন্তু বীজের কারণেই গাছগুলি এখন বিপন্ন। সংগ্রহকারীরা খুব চড়া দামে বীজগুলি কিনে থাকেন। রীতিমত বিজ্ঞাপন দিয়ে সারা বিশ্বে ওই বীজ বিক্রি করেন ব্যবসায়ীরা। ফলে বহু বীজ মাটিতে পড়ে অঙ্কুরিত হওয়ার অবকাশই পায় না। তাই গাছও জন্মাচ্ছে কম। ফলে ওই বিরল গাছটি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। তাই বিজ্ঞানীরা ওই বীজ না কেনার আবেদন করেছেন।

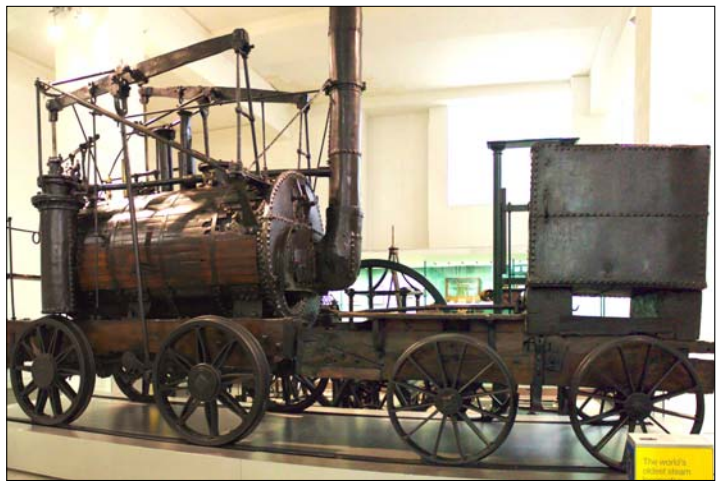

প্রাচীনতম ইঞ্জিন

নাম তার 'পাফিং বিলি' অর্থাৎ বিলি, যে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যায়। পৃথিবীর এই প্রাচীনতম বিদ্যমান স্টিম ইঞ্জিনটি তো সত্যিই এক সময় বাতাসে কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে, পায়ে-চলা গতিতে চলত। যাত্রিবাহী ট্রেন টানত না সে। ইংল্যান্ডের ওয়াইল্যাম কোলিয়ারি থেকে কয়লা বোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যেত পাঁচ মাইল দূরে টাইন নদীর ধারে, যেখানে কয়লা বোঝাই হত জাহাজে। এটাই ছিল তার প্রতিদিনের কাজ। তার জন্ম ১৮১৪ সালে। এখন সে আছে লন্ডনের চিত্তাকর্ষক সায়েন্স মিউজিয়ামে।

ফল খাও, গাছ লাগাও

প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের শৈশব থেকেই পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে তুলতে সম্প্রতি ফল খেয়ে গাছ লাগাবার কর্মসূচি পালন করা হয় বীরভূমের লাভপুর ব্লকের জামনা ও ঠিবা গ্রামপঞ্চায়েতের কৈচড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ঠিবা প্রাথমিক স্কুলে। জুলাই মাসে ওই স্কুলে 'ফল খাও গাছ লাগাও' নামে একটি বিশেষ উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়। প্রতিদিন যে পরিমাণ ফল খেয়ে তার বীজ আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিয়ে তা নষ্ট করে মানুষ, সেগুলি যদি মাটিতে যত্ন করে লাগিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি ফলের গাছ জন্মাতে পারে। আসতে পারে বিপুল পরিমাণ সুস্বাদু পুষ্টিকর খাদ্য। গাছেরা স্বাদে গুণে ভরপুর ফল নিখুঁত মোড়কে সৃষ্টি করে এই আশায় যে, যারা ফল খাবে তারা বীজগুলি ছড়িয়ে দেবে মাটিতে যাতে অঙ্কুরিত হয় বীজ, জন্মায় নতুন গাছ। পশু পাখিরা সে কাজটা করে। মানুষ বেশির ভাগ বীজই নষ্ট করে।

ডানায় ভর করেই কাটে বেশিটা জীবন

তাদের জীবনের বেশিরভাগ সময়টা ডানায় ভর করেই কেটে যায়। শুধু প্রজননের জন্য তারা ডাঙায় ফেরে। হবে নাই বা কেন, ডানা মেললে তার দৈর্ঘ্য যে ৩.৫ মিটার বা প্রায় ১১ ফিট। লম্বা ডানা নিয়ে সে তো পাখির সমাজে বৃহত্তম ডানার অধিকারী। সে সাগর পাখি, অ্যালবাট্রস। সেই ১৭৯৮ সালে কোলরিচের কবিতা 'দ্য রাইম অফ দ্য অ্যানশেন্ট মেরিনার'ই অ্যালবাট্রসকে বিখ্যাত করে তোলে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর জুড়ে তার বিচরণ, এমনকী সুদূর অ্যান্টার্কটিকা পর্যন্ত। কোনও বিশ্রাম ছাড়াই সাগর হাওয়ায় ভেসে ভেসে ঘন্টার পর ঘন্টা হাজার হাজার কিলোমিটার তার উড়ে চলা। কিন্তু দীর্ঘায়ু এই অ্যালবাট্রসও বিপন্ন'র তালিকায় উঠে এসেছে।

অ্যালবাট্রসের প্রায় ২৪ রকমের প্রজাতি। ডাঙায় তাদের দেখাই মেলে না তেমন। শুধু প্রজননের সময় ছাড়া। তখন কোনও প্রত্যন্ত দ্বীপে তারা বিশাল কলোনি গড়ে তোলে। জুটি বাঁধে। একটিই ডিম পাড়ে মা

অ্যালবাট্রস। সদ্য জাতের ওড়ার ক্ষমতা হতে সময় ৩ - ১১ মাস লেগে যায়। সেটা অবশ্য নির্ভর করে প্রজাতির ওপর। তবে একবার আকাশে ডানা মেললে, তারা আর সহজে ডাঙায় ফেরে না। প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত, তা সে পাঁচ থেকে দশ যত বছরই লাগুক না কেন, মাটিতে আর পা রাখে না তারা।

বিপন্ন যারা

অ্যালবাট্রসরা বাঁচে প্রায় ৫০ বছর। বেশ কিছু প্রজাতি আছে যারা আজীবন জোড় বেঁধে থাকে। অসাধারণ তাদের দৃষ্টিশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি। মধ্য আকাশ থেকে ছোঁ মেরে জলের গভীর থেকে অনায়াসে মাছ তুলে নিতে পারে। নানা ধরনের মাছ, কাঁকড়া, স্কুইড ও জলজ প্রাণীই তাদের খাদ্য। তবে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গেও তারা সাগর পাড়ি দেয় এই আশায়, যদি কিছু খাবার মেলে। এই বিশাল পাখিটি দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে দেয় যেন আকাশের নিরাপত্তায়। তবে একমাত্র মানুষই তাদের শত্রু। দক্ষিণ সাগরে অবৈধ মাছ বিশেষত টুনা শিকারের সময় নানা প্রজাতি মিলিয়ে বছরে নাকি প্রায় লাখ খানেক অ্যালবাট্রস মারা পড়ে মানুষের হাতে। প্রায় ১৯ প্রজাতির অ্যালব্রাট্রসই প্রাকৃতিক পরিবেশে বিপন্ন হিসেবে তালিকাভূক্ত হয়েছে। অন্য দুই প্রজাতিও এখন হুমকির মুখে।

m~ ¸: b¤vkbvj
wRIM vwdK, G›

রক পাইথন শিকার করে বীরত্বের প্রমাণ দিতে হয়

আফ্রিকায় ক্যামেরুনের পনেরো বছরের কিশোর সাম্বোকে খালি হাতে বিশাল সাপের গর্তে ঢুকতে হয়েছিল বাবার আদেশ মান্য করতে। প্রবল সাহস না থাকলে সাম্বো সেদিন প্রায় ২০ ফুট লম্বা রক পাইথনকে তার গর্ত থেকে টেনে বার করে আনতেই পারত না। সাম্বো এবং গাবায়া উপজাতির অন্য সদস্যরা আজও তাদের সেই সনাতনি ঐতিহ্য মেনে চলেছে।

আসলে খুব ছোট থেকেই ওই জনগোষ্ঠির ছেলেদের পাইথনের গর্তে ঢুকে তাকে শিকার করা শেখানো হয়। ভয় পেয়ে গাবায়া কিশোর যাতে গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে না আসতে পারে তার জন্য গর্তের মুখও অনেক সময় বন্ধ করে দেওয়া হয়। অনেক সময় সেই অজগরের বজ্র কঠিন আলিঙ্গনে দম বন্ধ হয়ে তাদের কেউ কেউ মারাও পড়ে। তবু রক পাইথন শিকারের ওই সনাতনি প্রথা বন্ধ হয়নি।

সাহারার আশপাশে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রাজত্ব করা ওই রক পাইথনরা আফ্রিকার বৃহত্তম ও পৃথিবীর মধ্যে ষষ্ঠ বৃহত্তম সাপ হিসেবে পরিচিত। সাভানা তৃণভূমি, নদী উপত্যকায় ও ঘন জঙ্গলে ঢাকা আদামাওয়া মালভূমিতে সব চেয়ে বেশি রক পাইথনের বাস। রক পাইথন বিষ-হীন সাপ। তবে তাদের দাঁত করাতের মতো খুরধার। একবার বাগে পেলে ওই দাঁত শিকারের গায়ে বিঁধিয়েই তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলে। অচিরেই

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে শিকারের মৃত্যু ঘটে। নভেম্বর থেকে মার্চ তেমন বৃষ্টি হয় না ওই অঞ্চলে। এই সময়ে পিঁপড়েখেকো প্রাণীদের ফেলে যাওয়া গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে রক পাইথনরা। আর সেই গর্তের মধ্যে মশাল বা জোরালো আলোর টর্চ নিয়ে ঢুকে পড়ে গাবায়া গোষ্ঠীর পাইথন শিকারিরা। গর্ত ছোট হলে আশাপাশ দিয়ে খুঁড়ে নেয় তারা। তারপর সাপের মুখটি চেপে ধরে ধীরে ধীরে বাইরে বার করে আনে। পাইথন শিকারিরা বেশ চড়া দামেই তাদের চামড়া, মাংস, ডিম আফ্রিকার খোলা বাজারে বিক্রি করতে পারে।

আইন কানুন ও পরিবেশের তোয়াক্কা না করেই গাবায়া জনগোষ্ঠির মানুষ এভাবেই রক পাইথন নিধন করে চলেছে।

তারা দেখতেই ব্যস্ত, সমুদ্র তাই অজানা

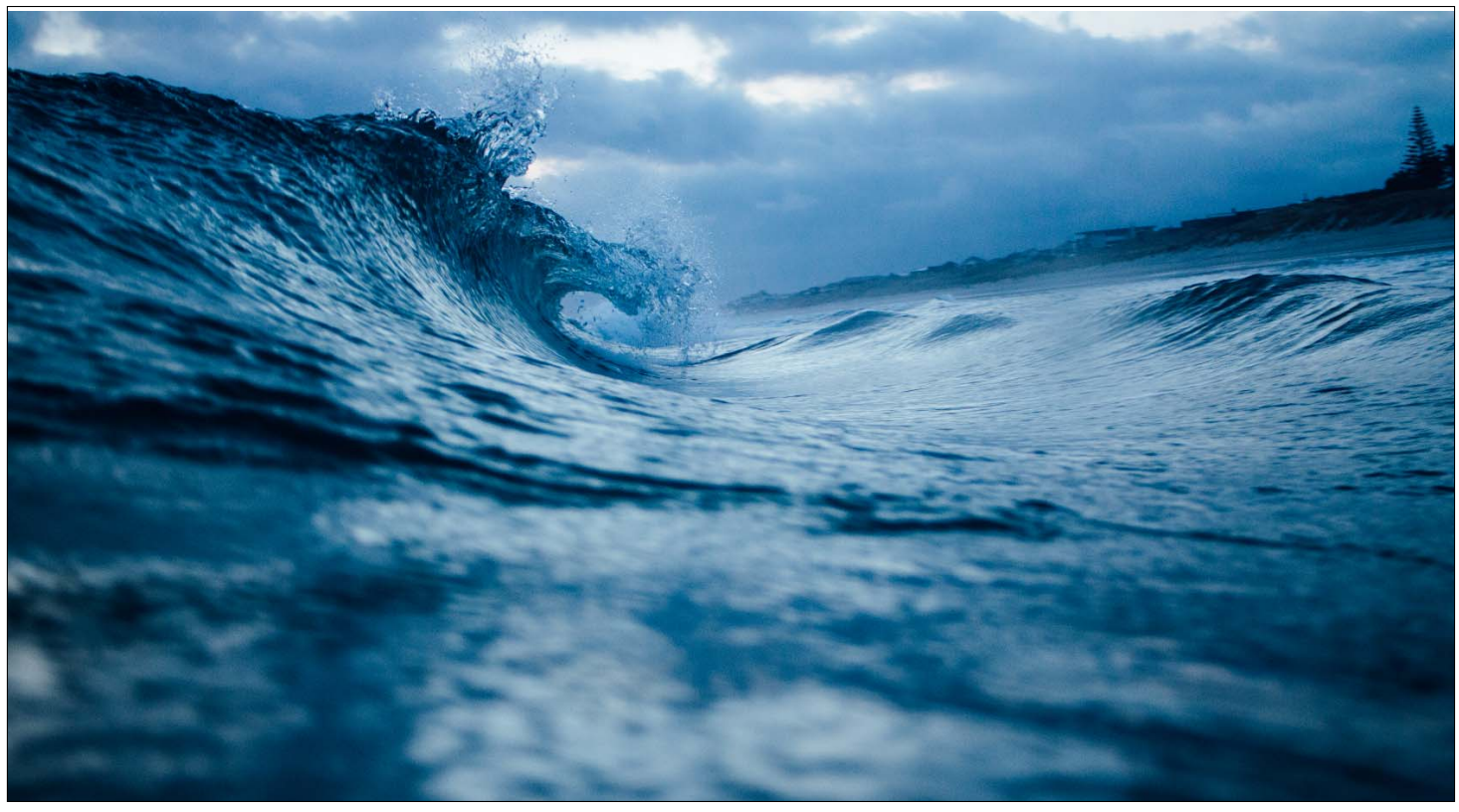

চেনা অচেনা জগৎ

পৃথিবীর ৭০ ভাগই জুড়ে আছে জল, অথচ মানুষ সমুদ্র সম্পর্কে খুব কমই জানে। জলের গভীরে যে অচেনা, অজানা জগৎ আছে তা নিয়ে আমাদের আগ্রহ কম। মানুষ তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই সে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহতারার মধ্যে কী যেন খুঁজে চলেছে। হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূরে কোন তারার পাশে কোন গ্রহ কী ছন্দে ঘুরপাক খাচ্ছে আর তাতে জল আছে কি না তাই নিয়ে চলছে বিস্তর গবেষণা। কিন্তু পৃথিবীর সমুদ্র, যার জলতরঙ্গে একদিন প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সমুদ্রকে মানুষ কিছুটা উপেক্ষা করে চলেছে আজও। এখনও পর্যন্ত ১২ জন মানুষ ৩,৮৪,৪০০ কিমি দূরের চাঁদে পা রেখেছেন। অথচ ১১ কিমি নীচে, সমুদ্রের গভীরতম অঞ্চল 'মারিনা ট্রেঞ্চ'-এ এ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছেন মাত্র তিন জন।

'লাইভ সায়েন্স'-এ এক লেখায় বলা হয়েছে, কেবল মাত্র সমুদ্রের প্রাণিজগৎ সম্পর্কেই যে বিজ্ঞানীদেরও ধারণা কম তাই নয়, সমুদ্রের গভীরে যে এক ধরনের শব্দ হয়, তারও কোনও ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায়নি। এক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্রে ধরা পড়ে সেই আওয়াজ। বিজ্ঞানীরা তাকে বলেন 'ব্লুপ'। কিন্তু কী তার উৎস তা জানা যায় নি এখনও।

সমুদ্র মানেই তো জলের বিপুল আধার। কিন্তু সমুদ্রের মধ্যেও আছে নদী, বড় বড় দীঘির মত জলাশয়। ওই নদী আর জলাশয়গুলির জল সমুদ্রের বাকি অংশের জলের থেকে বেশি নোনা ও ভারী। সেই নদী ও হ্রদগুলিরও পাড় থাকে, জলে থাকে স্রোত আর তরঙ্গ।

আশ্চর্যের কথা হল সমুদ্রে জলপ্রপাতও আছে। পৃথিবীর স্থলভাগের সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত হল আফ্রিকার জাম্বিয়ায়, জ্যাম্বিজি নদীর ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। সেটি ১.৭ কিমি চওড়া, জল পড়ে ৩৬০ ফিট ওপর থেকে। তার গর্জনে গমগম করে চারদিক।

কিন্তু সমুদ্রের তলায় যে জলপ্রপাত আছে তার তুলনায় ভিক্টেরিয়া ফলস যেন অতি ক্ষুদ্র। সমুদ্রের গভীরে, গ্রিনল্যান্ড আর আইসল্যান্ড-এর মাঝখানে আছে সেই বিপুল জলপ্রপাত। একদিকের ঠান্ডা জল অন্যদিকের তুলনায় উষ্ণ জল ঠেলে প্রায় ১১,৫০৫ ফিট নীচে নেমে আসে। বলা হচ্ছে আমেরিকার নায়াগ্রা জলপ্রপাতের তুলনায় ২,০০০ গুণ বেশি জল প্রবাহিত হয় সেখানে।

তাছাড়া সমুদ্রের জলে সোনা আছে। একেবারে আসল খাঁটি সোনা। তবে তা জলের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে আছে যে তাকে ছেঁকে বার করা দুষ্কর। আবার জলের তলায় মাইল দুয়েক নীচে পাথরের মধ্যেও আছে সোনা। কিন্তু তা বার করার মত খনন সরঞ্জাম মানুষের হাতে নেই। মনে করা হচ্ছে সমুদ্রের জলে এবং পাথরের চাঙ্গরে যে সোনা লুকিয়ে আছে তা যদি পুরোটাই সংগ্রহ করা যেত, তার পরিমাণ হত এতই বিপুল যে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের হাতে আসত প্রায় ন' কেজি ওজনের সোনার তাল।

দেওয়াল লিখন

অন্ধ্রের পর পশ্চিমবঙ্গই ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাছ উৎপাদক রাজ্য। এবং দেশের মোট উৎপাদিত মাছের ১৬% ই হয় পশ্চিমবঙ্গে।

ডাউন টু আর্থ

RNI Regn No. WBBEN/2000/01531 Date of Publication: October 1 2016 Postal Regn No.KOL RMS/262/2016-18

অবাক পৃথিবী

● পিঁপড়েদের কোনও ফুসফুস নেই। তারা কখনও ঘুমোয় না। আর পৃথিবীতে মাথাপিছু মানুষের জন্য ১০ লক্ষ করে পিঁপড়ে আছে।

● বারাণসী হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীনতম নগরী, যেখানে আড়াই হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে মানুষের ধারাবাহিক জীবনযাত্রায় কখনও ছেদ পড়েনি।

● এখন পর্যন্ত পৃথিবীর নথীভুক্ত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হল মাইনাস ৮৯.২ ডিগ্রি। ১৯৮৩ সালে ২১ জুলাই রাশিয়ার ভস্তক স্টেশনে ওই তাপমাত্রা মাপক যন্ত্রে ধরা পড়েছিল।

● পৃথিবীর শুষ্কতম জায়গা হিসেবে চিহ্নিত চিলি ও পেরুর আটাকামা মরুভূমি। এই মরুভুমির কেন্দ্রে এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে কোনও দিন এক ফোঁটা বৃষ্টিও হয়নি।

মাস্তর বন্ধুটি

কৃষ্ণ ধর

সবাই বলে চড়াই বড়ই ছটফটে
তিড়িং বিড়িং পিড়িং পিড়িং
ফুরুৎ ফুরুৎ ফরফরিয়ে আসছে যাচ্ছে
ঝুমকো জবার পাতার আড়াল
সকাল দুপুর দাপাচ্ছে।
মাস্ত বলে, চড়াই তুমি পারোও বটে
যখন তখন রেলিং ধরে ঝুলে পড়ো
কুট্টি মিষ্টি তোমার দৃষ্টি
চোখ দুটোও বড়ো বড়ো
এদিক ওদিক ঘুরছো কেমন চটপটে।
গা ঝেড়ে নাও ঠোঁট ঘষে নাও
পাড়া বেড়াও পরছো কেমন নতুন সাজ
অবাক সবাই দেখছে আজ
ঝাঁক বেঁধে ওই শালিখ দ্যাখো
টুনটুনিও তোমার সাজের পাচ্ছে আঁচ।
ইষ্টি কুটুম মিষ্টি কুটুম বুঝতে পারি
পাশের বাড়ি নেমন্তন্ন দিচ্ছো পাড়ি
সঙ্গে সাথী দেখনহাসি ঝিলিক চোখে
যাচ্ছে কে? বলবে তুমি ঘাড় বেঁকিয়ে
সব কথা কি বলতে আছে সবাইকে?
মাস্ত বলে, মিষ্টি চড়াই একবার কি
আসবে তুমি আমার কাছে
কখন থেকে বসে আছি তোমার জন্য
বারান্দায় - যাওয়া আসার জানলা খোলা
চেয়ে দ্যাখো কী সুন্দর রোদ উঠেছে পুব দিকে।

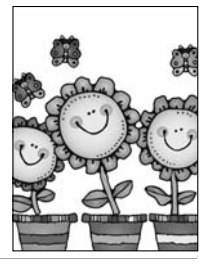

পৃথিবীর ডায়েরি

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩০ টাকা (ডাক মাশুল সহ)

স্কুল, কলেজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যে কোনও অন্য সংস্থা অথবা ব্যক্তিবিশেষ এই পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন। মানি-অর্ডার বা চেক দ্বারা টাকা পাঠান। চেক লিখবেন Prithibir Diary নামে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রকাশক
পৃথিবীর ডায়েরি
সি-এল ২৫৫, সেক্টর-২, সল্ট লেক, কোলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪/৯৪৩৩০৪৬৬৯৫

পাতিরাম

(কলেজস্ট্রিট-হ্যারিসন রোড ক্রসিং)

c w_exi Wv qwi cvIqv hvq

ক্যুইজ?!?!

১। জলহস্তি সম্পর্কে নীচের কোন তথ্যটি ঠিক নয়?
(ক) সম্পূর্ণ নিরামিশাষী (খ) সূর্য অস্ত গেলে জল থেকে উঠে খাবারের সন্ধানে বহুদূর যায় (গ) হাই তোলার মতো হাঁ করলে বুঝতে হবে তার রাগ হয়েছে (ঘ) ঘামের কোনও গ্রন্থি নেই

২। এদের মধ্যে কি যোগসূত্র?
(ক) চিনের লিউ ইয়াঙ (খ) আমেরিকার স্যালি রাইড (গ) ইটালির সামান্থা খ্রিস্টোফরেত্তি (ঘ) জাপানের চিয়াকি মুকাই

৩। এরা কি?
(ক) এএফপি (খ) পিটিআই (গ) তাস (ঘ) জিনহুয়া

৪। কিসের কথা বলছি?
(ক) শুয়োরের আছে ৪ (খ) গন্ডারের ৩ (গ) ছাগলের ২ (ঘ) ঘোড়ার ১

৫। কি জিনিস এখন প্রায় সবাই সব সময় ব্যবহার করে, কিন্তু সরকারি কাজে প্রথম ব্যবহার হয়েছিল ফ্রান্সে-১৫৮২ সালে; ব্রিটেনে ১৭৫২ সালে; জাপানে ১৮৭৩ সালে; আর রাশিয়ায় ১৯১৮ সালে?

৬। এদের মধ্যে কে বা কারা বিশ্ব কাপ ফুটবলের ফাইনালে ৩ টে গোল দিয়েছেন?
(ক) পেলে (খ) রোনাল্ড (গ) জিওফ হার্স্ট (ঘ) জিনেদাইন জিদানে

৭। এই চারজনের কোন কৃতিত্ব আর কারও নেই?
(ক) ক্রিস গেইল (খ) ডন ব্র্যাডম্যান (গ) ব্রায়ান লারা (ঘ) সেহবাগ

৮। ভারতের কোন শহরকে তার জাঁক জমকের জন্য নতুন ইসপাহান বলা হত?
(ক) হায়েদ্রাবাদ (খ) ফতেপুরসিক্রি (গ) আহমেদাবাদ (ঘ) লক্ষ্ণৌ

৯। পৃথিবীর একটি মাত্র দেশের উপর দিয়ে বিষুবরেখা ও একটি ক্রান্তি রেখা গেছে। এদের মধ্যে কোনটি সেই দেশ?
(ক) চিন (খ) ইন্দোনেশিয়া (গ) ব্রেজিল (ঘ) মাদাগাস্কার

১০। সাহিত্যের জন্য সব থেকে বেশি বার নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন কোন দেশের লেখকরা?
(ক) ইটালি (খ) ফ্রান্স (গ) আমেরিকা (ঘ) রাশিয়া

উত্তর: ১/ক; ২/ প্রত্যেকে নিজের দেশে প্রথম মহিলা মহাকাশচারি; ৩/ সংবাদ সরবরাহ সংস্থা (নিইজ এজেন্সিস); ৪/ পায়ের আঙুল; ৫/গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার, যার সাল তারিখ এখন সর্বত্র গৃহীত; ৬/ক,গ,ঘ; ৭/ দুটি টেস্ট ম্যাচে ৩ সেঞ্চুরি বা তিন শতাধিক রান করেছেন; ৮/ক; ৯/গ; ১০/খ।

একটি গাছ, অনেক প্রাণ

স্বত্বাধিকারি অনীশ গুপ্তর পক্ষে তাঁর দ্বারা ইন্সট্যান্ট প্রিন্ট, ৭০এ, এস.এন. ব্যানার্জি রোড, কোলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক: মালবী গুপ্ত। যোগাযোগ: সি-এল ২৫৫, সল্টলেক-২, কলকাতা-৭০০০৯১। ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪। ই-মেল: prithibir_diary@rediffmail.com